অন্নদামঙ্গল কাব্যের রসবিচার

'যে হৌক সে হৌক ভাষা...' কিন্তু তা যেন হয় ... 'রস' লয়ে। অর্থাৎ, কাব্যের মুখ্য বস্তু 'রস'। কৃষ্ণনাগরিক রাজসভাকবি যে-যুগে কাব্যের ক্ষেত্রে এ হেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেই যুগে 'রস' বলতে বোঝানো হত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত নবরসের কোন একটিকে। রাজসভাকবি ভারতচন্দ্রও কি সেইটুকুই বুঝতেন? রাজার মনোরঞ্জনের পেশাদারিত্বে যুগের রুচি ও মানসিকতার ধাত্রীত্ব করেছেন যিনি তাঁর পক্ষে হয়তো সেটাই স্বাভাবিক। তবু তাঁর সচেতন শিল্পীসত্তাকে উপেক্ষা করবেন কিভাবে? যুগসঞ্চিত ক্ষোভ, হতাশা, পুঞ্জীভূত অতৃপ্তি আর অপরিসীম জীবনাভিজ্ঞতাসঞ্জাত জীবনবোধ তো নিছক অলঙ্কারশাস্ত্রের কোনো একটির দিকনির্দেশে চালিত হতে পারে না। ভারতচন্দ্র তাই আত্মপ্রতারণা করেননি। নির্মোহ তাঁর কবিমানস, তথাকথিত বাস্তব বা সত্য আসলে যে প্রহেলিকা, মিথ্যার আভরণে প্রদর্শিত কলঙ্কিত যুগজীবন—সে কথাই তাঁর কবিধর্মে প্রকাশিত। আর এ-কারণেই সে কবিকর্ম তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। গভীরতম জীবনবোধ থেকে জাগ্রত সেই বিশ্লেষণভঙ্গি আদিরসাত্মক হাস্যরসময় এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক। কাজেই *অন্নদামঙ্গল* কাব্য-কে নেহাৎ 'আদিরসধর্মী' বা 'হাস্যরসপ্রধান' কাব্যের নিঃসঙ্গ অভিধায় ফেলা হয়তো সঙ্গত হবে না।

প্রমথ চৌধুরী ভারত-কাব্যের [illegible] মূল্যায়ন করেছেন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্য অশ্লীল বলে যে প্রচার ও নিন্দা অর্জন করেছিল বীরবলী মূল্যায়নে তা অন্য মাত্রা পায়। 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে তিনি জানালেন—

> "ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন যে, তাঁর কাব্যে প্রসাধন থাকবে ও তা হবে রসাল। এই দুই বিষয়েই তাঁর মনোষ্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। গোল তো এখানেই। যে রস তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ রস, সে রস এ যুগে অস্পৃশ্য। কেননা তা হচ্ছে আদিরস। উক্ত রসের শারীরিক ভাষ্য এ যুগের কাব্যে আর চলে না, চলে শুধু দেহতত্ত্ব নামক উপবিজ্ঞানে।"

কিন্তু এরপরেই তিনি বললেন—

> "ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদি রস নয়, হাস্যরস। এ-রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিক। জীবন নয়, মন। ..হাসি জিনিষটেই অশিষ্ট, তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক মূঢ়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মূঢ়তার প্রতি সত্যের বক্রোক্তি।"

—সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর বিশ্লেষণে দু'টি পৃথক রসপ্রসঙ্গ ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রসঙ্গে উঠে আসছে—আদিরস এবং হাস্যরস। ভারতচন্দ্রের কাব্যে সম্ভোগচিত্র আছে—কিন্তু তা আদিরসাত্মক ভোগলিপ্সা নয়। এ-ভোগপ্রীতি সুস্থ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য।

> —ভারতচন্দ্রের ভারতী যোগ।
> যৌবনেতে কর যৌবনভোগ।। [রসমঞ্জরী]

এ 'যৌবনভোগ'-এর আনন্দ অবসরে পক্ষান্তরে আর একটি সুপ্তকথন ভাস্বর হয়ে ওঠে। তা হল নারী-পুরুষের সমানাধিকার। পুরুষ এবং নারীর প্রেমের এবং ভোগের সাম্রাজ্যে

পরিপূরকতা। তাই *রসমঞ্জরী*-র নায়ককে পূর্ণ দৃষ্টিতে সমাজ, সংসার আর ব্যক্তিজীবনে নারীর স্থান লক্ষ করে বলতে শোনা যায় :

প্রমদা বন্ধন সংসারেরি
প্রমদা আকার আহমা দেরি,
সতত রাখহ সযত্নে তায়—সুরত্ন প্রায়॥

অন্নদামঙ্গল-এর প্রথম খণ্ডে কবি তাই নারীর মুখ দিয়েই স্বাভাবিক ভোগজীবনের পক্ষে দাবি উপস্থিত করিয়েছেন। বসুন্ধর-পত্নী স্পষ্ট ভাষায় তার দাবি জানিয়েছে দেবীর কাছে। বসুন্ধর কুবেরের অনুচর। দেবীর অভিশাপে সে জন্মেছিল মর্ত্যে—এবং এখানে তিনটি বিবাহ করে সুখে দিন কাটাচ্ছিল। স্বামী-বিচ্ছিন্না, বিরহিণী বসুন্ধর-পত্নী বসুন্ধরা স্পষ্ট ভাষায় এবং অকাট্য যুক্তিতে অন্নদার কাছে তাকে বিরহদশা থেকে মুক্ত করার আবেদন জানিয়েছে। অন্নদার কাছে স্পষ্টকথনে ফুটে উঠেছে তার অকাট্য যুক্তি। স্বাভাবিকভাবেই মর্ত্যবাসী স্বামীর নবপত্নীসুখে সে ঈর্ষান্বিত। দেবী হলেও অন্নদা বুঝবেন স্বামীবিহনে তার দেহভোগের অতৃপ্তির বিষয়টি :

ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রী-পুরুষে কৈলা রতিসৃষ্টি॥

অনাবৃত সত্যভাষিতায় বিমূঢ় দেবী তার প্রার্থনা পূরণ কবলেন, মর্ত্যে বসুন্ধরের পত্নী হওয়ার জন্যে তার জন্ম হল। আসলে বসুন্ধরার এই অবস্থার জন্য দায়ী তো দেবীই। তাই দেবীকে মেনে নিতে হল বসুন্ধরার প্রার্থনাকে, কামের বাস্তব চাহিদাকে।

কুবেরের অনুচর বসুন্ধর অন্নদাপূজার জন্য পুষ্পচয়ন করতে গিয়ে ঋতুরঙ্গের চক্রান্তে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। অন্নদার জন্য তোলা ফুলে রচনা করেছিল পুষ্পশয্যা—যাপন করেছিল নববাসর। এই অপরাধের জন্য ডাকিনী-যোগিনীরা যথার্থ রসিকতার সঙ্গে বসুন্ধর ও বসুন্ধরাকে 'ফুল মালা সঙ্গে বুকে বুকে বাঁধি রঙ্গে' অন্নদাসমীপে হাজির করেছিল—রুষ্টা দেবী শাপ দিয়েছিলেন—মর্ত্যে গিয়ে মনুষ্যজন্ম নাও। সেখানে গর্ভবাসের যন্ত্রণা, জ্ঞানহীনতা, পরদুঃখকাতরতার অশান্তি প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করবে বসুন্ধরকে। মর্তলোক যে রৌরবকুম্ভীপাক নরকেরও অধম—এমনটা মনে করে কুবেরপুত্র নলকূবরও।

কুবেরের অনুচর বসুন্ধর-আর কুবেরের পুত্র নলকূবর। বসুন্ধরের মতোই নলকূবর পত্নীর সঙ্গে মধুমাসে রতিরঙ্গে মেতেছিল। এবং মর্তবাসের অভিশাপ পেয়েছিল দেবীর কাছে থেকে। বসুন্ধরের সঙ্গে নলকূবরের আচরণের তফাৎ এইটুকু—সামান্য অনুচর হিসেবে বসুন্ধর অন্যায়ভাবে ধরা পড়ার পরেই অপরাধসচেতন, অপরপক্ষে কুবের-পুত্র নলকূবর নিজ অন্যায়ের সমর্থনে রাজকীয় ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশী অন্নদার কাছে। নলকূবর একইসঙ্গে ধনমত্ত ও কামোন্মত্ত। নারীবেশে স্বয়ং দেবীও তার কাছে যেতে সাহস পাননি—ধারণ করতে হয়েছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ। অন্নদাপূজার সময় যুবতীবিহারে লিপ্ত নলকুবরকে তিরস্কার করলে সে সদম্ভে জানিয়েছে :

এ সুখযামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক॥
জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।

অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥
শঙ্কর ভিখারী সে তো তারি নারী
আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে
দিনে আসে তিনবার॥

—স্থূল ভোগের এ এক নির্লজ্জ দৃশ্য। রসিক জনের মনোহরণ করে যা তাই রস। 'রস' হল 'চিত্তমাসৃন্যব্যঞ্জক' অবস্থা বা চিত্তের আস্বাদজনক পরিস্থিতির নাম। আদিরস যদি *অন্নদামঙ্গল*-এর মূল অবলম্বন হয় তবে তা চিত্তকে আহ্লাদিত করল কিভাবে? বরং এই স্থূল আত্মভোগের বিরুদ্ধে কবির 'আত্মিক বিরাগ' তো পাঠককেও সেই পথে পরিচালিত করল।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে আদিরসাত্মক দ্বিতীয় প্রসঙ্গ 'রতিবিলাপ'। ভারতচন্দ্রের কাব্যপরিকল্পনায় ক্লাসিক ও লৌকিক—উভয় স্বভাবই ক্রিয়াশীল। ক্লাসিক বলতে সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য, অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদিকেই বোঝায়। আর লৌকিক বলতে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য তথা সমকালীন লোকরুচিকে ধরা যায়। সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে কালিদাসের অনুসরণ মূলত প্রথম খণ্ডে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে এসে পড়ে শিবের ধ্যানভঙ্গের পর 'কামভস্ম' ও 'রতিবিলাপ'—এই দু'টি অংশ। কালিদাসের *কুমারসম্ভব* কাব্যের 'মদনভস্ম' অধ্যায়টি মহত্তম কবিকল্পনার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রতিবিলাপের মধ্যেও কবির শিল্পনৈপুণ্য উজ্জ্বল। কিন্তু ভারতচন্দ্র এই অংশে কি করলেন? দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'ভারতচন্দ্রের রতি সামান্য গণিকার ন্যায় কৃত্রিমসুরে পতিবিয়োগে বিলাপ করিতেছে।' শঙ্করীপ্রসাদ বসু বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখেছেন। তিনি দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে জানাচ্ছেন—"দীনেশচন্দ্র একটি জিনিস খেয়াল করে দেখেননি—ভারতচন্দ্র ইচ্ছে করেই রতিকে দিয়ে গণিকার কান্না কাঁদিয়েছেন, কারণ রতিকে তিনি রতিই ভেবেছিলেন। —রাধিকা ভাবেন নি।" (*কবি ভারতচন্দ্র*/পৃ. ২০৬) ভারতচন্দ্র আদ্যন্ত অনুধাবন করেছিলেন কালিদাসকে। তবু 'শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম' অংশে ভারতচন্দ্র যেন শ্লীলতার সীমান্ত-সীমা লঙ্ঘন করে গেলেন। ধ্যানস্থ শিবকে বিবাহে আগ্রহী করতে রতিদেব তাঁর উদ্দেশে পুষ্পশর নিক্ষেপ করলেন। কামজর্জর অবস্থায় ধ্যান ভেঙে সামনেই মহাদেব দেখেন মদনকে এবং তাঁর ত্রি-নয়ন থেকে ললাটাগ্নি নিক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস করে কামদেবকে। কাহিনীর এই অংশটুকু বহুল প্রচলিত। ভারতচন্দ্রীয় চমক এর পরে :

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।

—এই মুগ্ধতার আবেশ যে কতখানি নির্লজ্জ হতে পারে পরবর্তী অংশেই তার নিদর্শন রেখেছেন কবি :

বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর দেখিয়া অন্তর
কিন্নরী দেবী সকল
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

এরকম একটি চিত্র আঁকার কারণ হিসেবে বলতে হয় আদিরসাত্মক আবিলতাকে সমসাময়িক সমাজের সমান্তরাল অধোগামিতার অভিমুখে প্রবাহিত করে দেওয়া। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের আদিরসাত্মক চাহিদাকে উসকে দেওয়া। অনুগ্রহ-নির্ভর কবিদের সেই রুচিবিকৃতিকে পরিতৃপ্ত করতে নিম্নগামিতার পিচ্ছিল স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার নির্লজ্জতা। আর সর্বোপরি এক অসংবৃত চরিত্র, স্খলিতবেশ স্খলিতবাক্ দেবতাকে সম্পূর্ণ হীনপ্রভ করে যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে ধর্মের অসারতা প্রমাণ করা।

তাই *অন্নদামঙ্গল*-এর 'আদিরস' *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডের অবলম্বন নয়—সমাজপরিবর্তনজনিত একটি উন্মত্ত ব্যাধির প্রকাশমাত্র।

সুতবাং রসবিচারে দ্বারস্থ হতেই হয় বীরবলী সিদ্ধান্তের। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস আদিরস নয়, হাস্যরস। এর অবস্থান হৃদয় নয়—মস্তিষ্ক। সুতরাং এ হাসি নিছক হিউমার নয় বরং উইটমিশ্রিত স্যাটায়ার। আর এই স্যাটায়ারধর্মী হাস্যরসের উৎসসন্ধানে তাঁর সিদ্ধান্ত . "সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।"

ভারতচন্দ্রের হাস্যরসসৃষ্টির চেষ্টা দু'ভাবে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। প্রথমত, চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয়ত, সংলাপে শানিত বুদ্ধির দীপ্তি ছড়িয়ে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডে রঙ্গ-রস সৃষ্টির দ্বিবিধ প্রয়াসই ঘটেছে মূলত শিবচরিত্রকে কেন্দ্র করে। দেবতা এখানে ব্রাত্য। স্যাটায়ারের মাধ্যমে তাঁর চরম হেনস্থা করেছেন কবি। শিব বিবাহের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে নারদের সঙ্গে গৌরীর কথোপকথনে বৃদ্ধ বর ও তরুণী ভার্যার অসম মিলন সম্ভাবনার প্রসঙ্গ বিশুদ্ধ হাস্যরস সঞ্চার করেছে :

মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে।
তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি।
ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী॥
নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে।
পাকা দাড়ি বুড়াবর ঘটাব তোমারে॥
আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত।
ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাৎ॥

নারদকে ঘটক বানিয়ে পর্বত-দুহিতার সমীপে বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন স্বয়ং দেবাদিদেবই। কারণ মদনাহত তিনি। তাই উমার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবের কথা শুনে :

শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার।
মুনি কহে দ্রুত সকলি প্রস্তুত
বর হয়ে কবে যাবা॥
কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা॥

বলদে চড়ে, শিঙ্গা বাজিয়ে চললেন শিব বিবাহযাত্রায়,—ভূত প্রেত সহযোগে .

এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়

প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়॥

বরের চেহারা এবং আচরণ দেখে চমকে উঠলেন হিমগিরিরাজ। বিবাহসভায় 'বাঘছাল খুলি উলঙ্গ হৈল হর'। খেদোক্তি আর আপশোসে হায়-হায় করতে লাগলেন মা মেনকা এবং উপস্থিত এয়োরা :

আহা মরি ও মা উমা সোনার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥

.....

আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে
কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে॥
আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।
কপালে আগুন তার আলো করে তায়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভুতুড়ের কপালে পড়িলে॥

আব তারপর বাঙালি জীবনের সেই পরিচিত দৃশ্য। অসমবিবাহের পরবর্তী পর্যায়ে দুঃখিনী কন্যাসন্তানটির জন্য মায়ের আজীবন কান্না :

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥

এ কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই নয়। এর জের চলল পরবর্তী দাম্পত্য দৃশ্যেও। হিমালয় ছেড়ে গৌরী কৈলাসে এসেছেন, স্বামীগৃহে। অভাবের নিত্য তাড়নায় মদনের কারসাজি অন্তর্হিত। কোন্দল, অনাহার আর ভিক্ষাযাত্রায় বিষময় হয়ে উঠেছে সংসার জীবন—'অন্নবিনা অন্নদার অস্থিচর্মসার'। আর সেই ভয়াবহ সংসারাভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে রুচিবিকারহীন নির্জলা হাসির উপকরণে। অনাহারে বুভুক্ষু শিব অলক্ষণা বলেছেন পার্বতীকে। ঝংকার দিয়ে উঠেছেন দেবী :

সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥

.....

বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥
তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কও কি কারণ॥...

পার্বতীর তিরস্কারে অনন্যোপায় শিব ভিক্ষায় বেরুলেন। গ্রাম্য বালকদের দৌরাত্ম্যে সে ভিক্ষাযাত্রাও পণ্ড হতে বসল :

দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় কত রঙ্গচিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥

কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥

আপাদমস্তক অসংগতিতে ভরা এক শ্রীহীন দেব চরিত্রকে নিয়ে কৌতুকে মেতেছেন কবি—কৌতুকে মেতেছে গোটা সংসার। সেই অসংগতি, যাকে কৌতুকের জন্মদাতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : "যাহা সুসংগত তাহা চিরদিনের নিয়মসম্মত, যাহা অসংগত তাহা ক্ষণকালে নিয়মভঙ্গ। যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মনের কোনো উত্তেজনা নাই। হঠাৎ না হইলে কিম্বা আর এক রূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।" (কৌতুকহাস্যের মাত্রা পঞ্চভূত) অ্যারিস্টটলও কমেডির আলোচনায় হাস্যকর বলতে যা 'অসুন্দর এবং বিকৃত কিন্তু বেদনাদায়ক নয়' এমন বিষয়কেই বুঝিয়েছেন। এই কৌতুকের মাত্রা চড়তে চড়তে কখন যেন অশ্রুজলের রূপ নেয়। স্বর্গীয় দম্ভ আর লালিত্যহারা মহাদেবের নির্লজ্জ বুভুক্ষা, অন্নদার কাছে ভিক্ষালব্ধ সামান্য অন্নভক্ষণকালে তাঁর আগ্রাসী ক্ষুধা কোনো দৈবী সংযমের শাসন না মানা কোন এক বেসুরো ছরার টানে মনকে ভেজায়।— সর্বহারা যুগের তাগিদে তখন একটিমাত্র সঙ্গীতই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে :

অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ॥

তাই কেবল মস্তিষ্ক নয়, শুধু বুদ্ধিকোষ নয়, হৃদয়ধর্মের সঙ্গেও জোড়া হয়ে যায় ভারতচন্দ্রে হাস্যচেতনা। স্টিফেন লিককের অভিমত তখন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে : "Humour may be defined as the kindly contemplation of life and the artistic expression there of." এই 'Artistic expression' নিঃসন্দেহে পরদুঃখকাতরতার সঙ্গে যুক্ত।

ভারতচন্দ্রের হাস্যরসসৃষ্টির দ্বিতীয় প্রসঙ্গ—বুদ্ধিদীপ্ত রচনার প্রবণতায় কৌতুকের অবতারণা। ব্যাস-প্রসঙ্গে কবির এহেন মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কারে এবং গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কারে যথার্থ রঙ্গব্যঙ্গের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। ব্যাসকাশী নির্মিতির তাগিদে একদা যে গঙ্গাকে তিনি আপ্লুত কণ্ঠে আরাধনা করেছিলেন :

তুমি নারায়ণী পতিতপাবনী
কামনা পূরাও মোর।
মোর সঙ্গে আসি প্রকাশহ কাশী
তারহ সঙ্কট ঘোর॥

সেই গঙ্গারই অপযশে মুখর হয়ে উঠলেন ব্যাস স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ার কারণে :

পুরাণে বর্ণিনু যেই পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই
নৈলে তোমা কে কোথা মানিত॥

****

বেশ্যাধর্ম লয়ে আছ জাতিকুল নাহি বাছ
রূপ গুণ যৌবন না চাও।

আঁতে ঘা লাগতেই গঙ্গাও অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন—ব্যাসকে নির্লজ্জ তিরস্কার করে বলেন :

তুমি রণ্ডা ভ্রাতৃবধূ করিয়া গমন।
জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন॥

কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া।
সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া॥
ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন।
তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন॥

.....

পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া।

বিশ্বকর্মার সঙ্গে বিবাদেও ব্যাসের একই মানসিকতা। সুতরাং ব্যাসদেবের প্রজ্ঞাঘন পৌরাণিক মূর্তিকে তছনছ করে ভারতচন্দ্র আবার দেখালেন অষ্টাদশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক রুচির বিকারগ্রস্ত রূপ। এতদিনের একপেশে ধর্মবিশ্বাসে তখন রীতিমত ফাটল ধরেছে। আর সেই ফাটলধরা ধর্মের কাঠামোর মুখোশ টেনে খুলে ফেলতে তিনি ব্যবহার করলেন তাঁর বিদ্রুপ কৌতুকে ভরা রচনাশৈলী। অনবদ্য এবং আকর্ষণীয় সে 'স্টাইল'—যে স্টাইলের গুণে তিনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ 'আর্টিস্ট'। এই স্টাইলের গুণে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের হাসি শুধু মুখের নয় মনেরও। "এ হাসি সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।" শব্দের খেয়ালী খেলায় রায়গুণাকর সেই বিশিষ্ট স্টাইলকে প্রবাদপ্রতিম করে তুললেন। "ধর্ম ও দেবতা, জগৎ ও জীবন সব কিছুর প্রতি ভারতচন্দ্র একটি ব্যঙ্গময় অবিশ্বাসী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন বলে তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে দিয়েই ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের একটি ধারা বয়ে চলেছে।" [*বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস*, অজিত দত্ত]

ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, অবিশ্বাস—জীবনেব এইসব নেতির দিক তবু ভারতচন্দ্রের রসবোধের পরিণাম হয়ে ওঠেনি। অসাম্য-পীড়িত সমাজে শৈল্পিক প্রতিবাদের জন্ম দিতে গেলে শুধু নেতি-নেতি করলে চলেও না। এক ধরনের ইতিবাচক সূক্ষ্মতার ঔদার্যে অনাচারগ্রস্ত ধর্মাচার, অন্তঃসারশূন্য সমাজ ব্যবস্থা, প্রথাসর্বস্ব মঙ্গলকাব্যের ঘেরাটোপের মধ্যে বসেও তাই অনায়াসে তিনি রচনা করলেন 'নূতন মঙ্গল'। মহাশক্তি অন্নপূর্ণা কল্যাণময়ী মাতৃরূপে হয়ে উঠলেন পরমরসের আকর। ভিখারি শিবের দুই পুত্রের (দ্র. ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য) সঙ্গে মিলে তৃপ্তির আহার্য গ্রহণ সেই রসেরই পূর্ণতার দিক হয়ে রইল। লীলাসুখে মেতে দেবী পরিবেশন করছেন অন্ন, আর এরই মধ্যে ক্ষুধার্ত ব্যাসের আনন্দহীন লোভ তপস্যার আকারে পরিপূর্ণ আনন্দসংসারে গাঢ় কালি ঢেলে দিলেও একসময় গভীর বেদনারসেব গভীরতায় তার পরিসমাপ্তিও ঘটল।